হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাহিনী শুনি

ইকবাল কবীর মোহন

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাহিনী শুনি

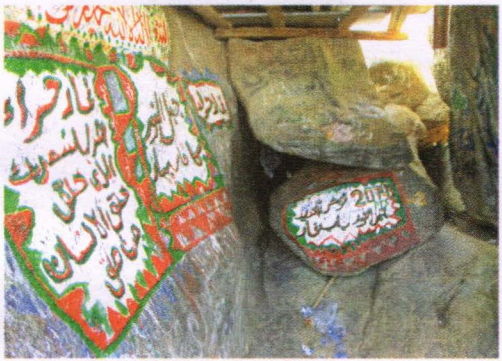

ইকবাল কবীর মোহন

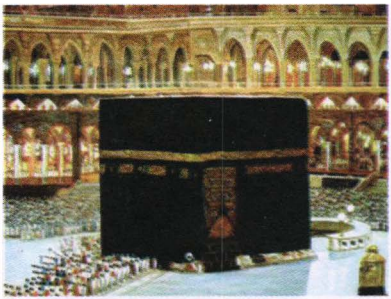

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাহিনী শুনি

ইকবাল কবীর মোহন

প্রকাশকাল : জুলাই ২০১৪
প্রকাশনায় : নার্গিস মুনিরা
শিশু কানন
৩০৭ পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা
ফোন : ০১৭১০-৩৩০৪৩০

মূল্য : ৮০ টাকা

ISBN: 984-8394-22-2

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাহিনী শুনি

ইকবাল কবীর মোহন

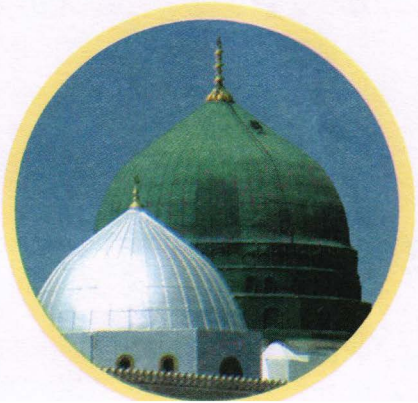

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাহিনী শুনি

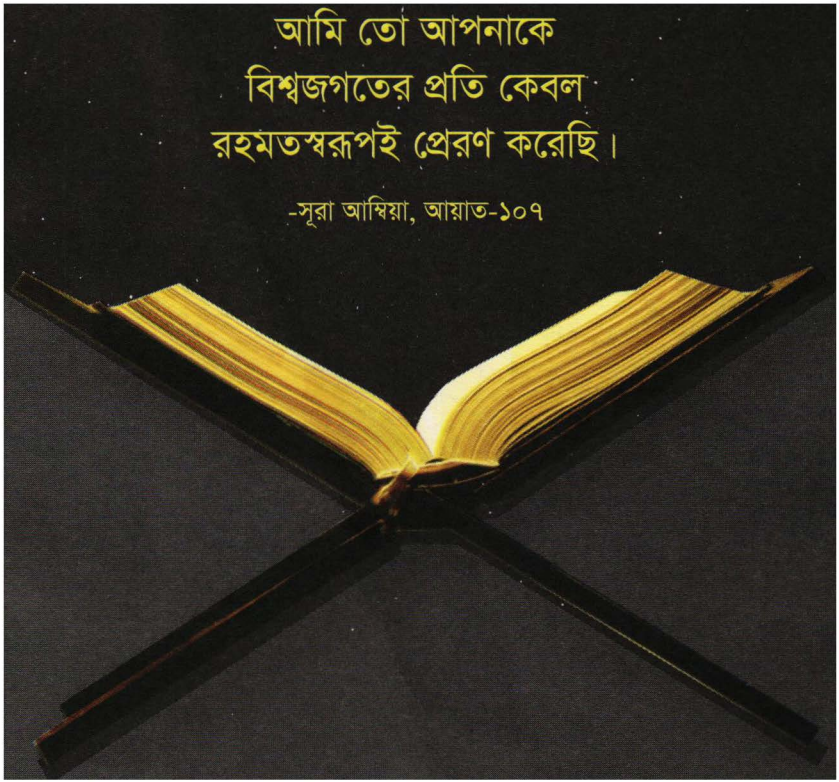
আমি তো আপনাকে
বিশ্বজগতের প্রতি কেবল
রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।
-সূরা আম্বিয়া, আয়াত-১০৭

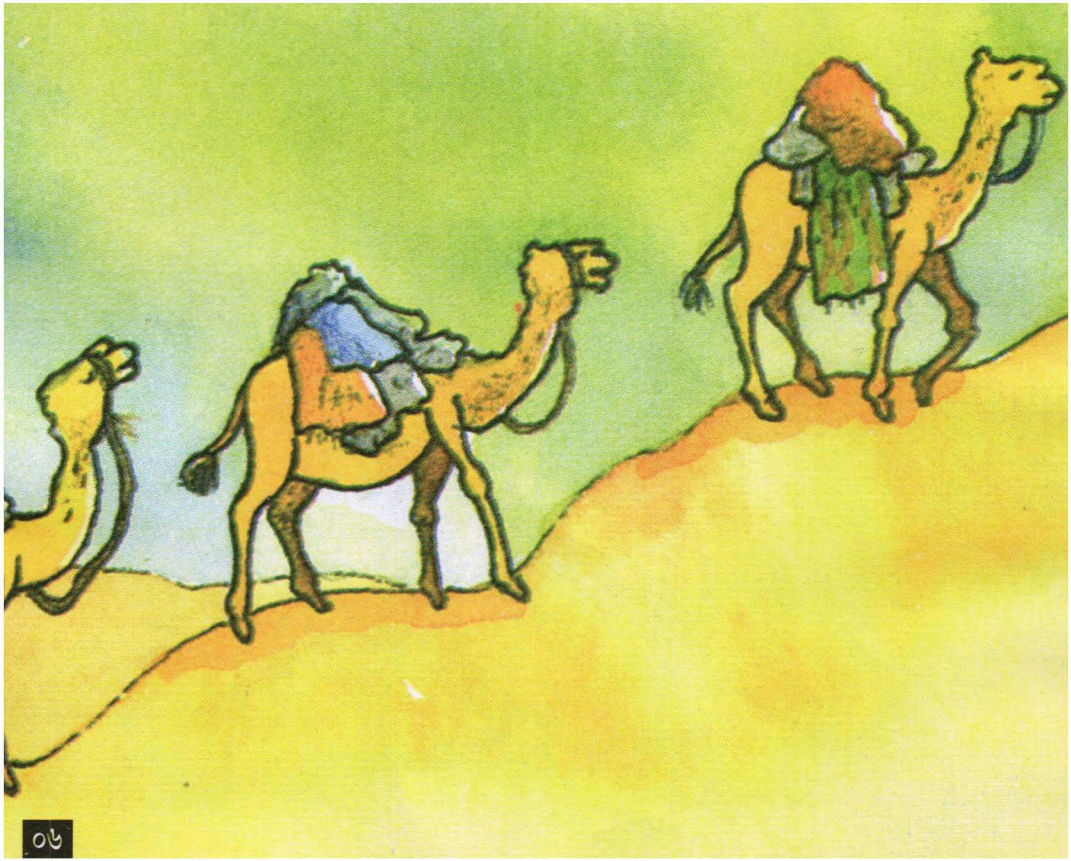

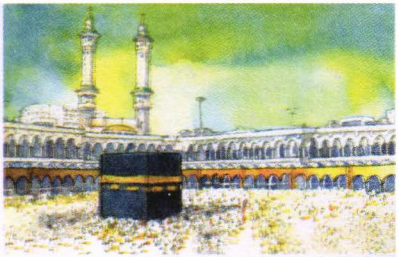

আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বছর আগের কথা। মক্কায় তখন কুরাইশ নামে বিখ্যাত এক বংশ ছিল। এই বংশের আদি পুরুষ আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহিম (আ)। তিনি পুত্র হযরত ইসমাইল (আ)-কে সাথে নিয়ে মক্কায় কাবাঘর নির্মাণ করেন। কুরাইশ বংশের লোকেরা কাবার দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করত। এ জন্য অন্য সবাই তাদেরকে সম্মান করত। এই বংশের হাশেমি নামে একটি সম্মানিত গোত্র ছিল। এই গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন এক বিস্ময়কর বালক। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ। মায়ের নাম আমিনা।

শিশুটির জন্মের সময় মক্কাজুড়ে ছিল সাজসাজ পরিবেশ। আকাশে-বাতাসে দেখা গেল খুশির আমেজ। আবদুল্লাহর ঘরে শিশু জন্মেছে-এ খবর দ্রুত আবদুল মুত্তালিবের কাছে গিয়ে পৌঁছল। তিনি আবদুল্লাহর বাবা, শিশুটির দাদা। খবর শুনে আবদুল মুত্তালিব যারপরনাই খুশি হলেন। তিনি নাতির নাম রাখলেন মুহাম্মদ।

আরবে তখন এক নিয়ম প্রচলিত ছিল। জন্মের পর শিশুদেরকে মরুভূমিতে পাঠিয়ে দেয়া হতো। সেখানে দুধমাতারা থাকত, যারা শিশুদের লালন-পালনের দায়িত্ব নিতো। শিশু মুহাম্মদ (সা)-কে মরুভূমিতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। মুহাম্মদ (সা)-এর দুধমার দায়িত্ব পেলেন হালিমা।

হালিমা ছিলেন দরিদ্র। তার সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। কিন্তু শিশু মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের পর হালিমার সংসার বদলে গেল। তার সব অভাব দূর হয়ে গেল।

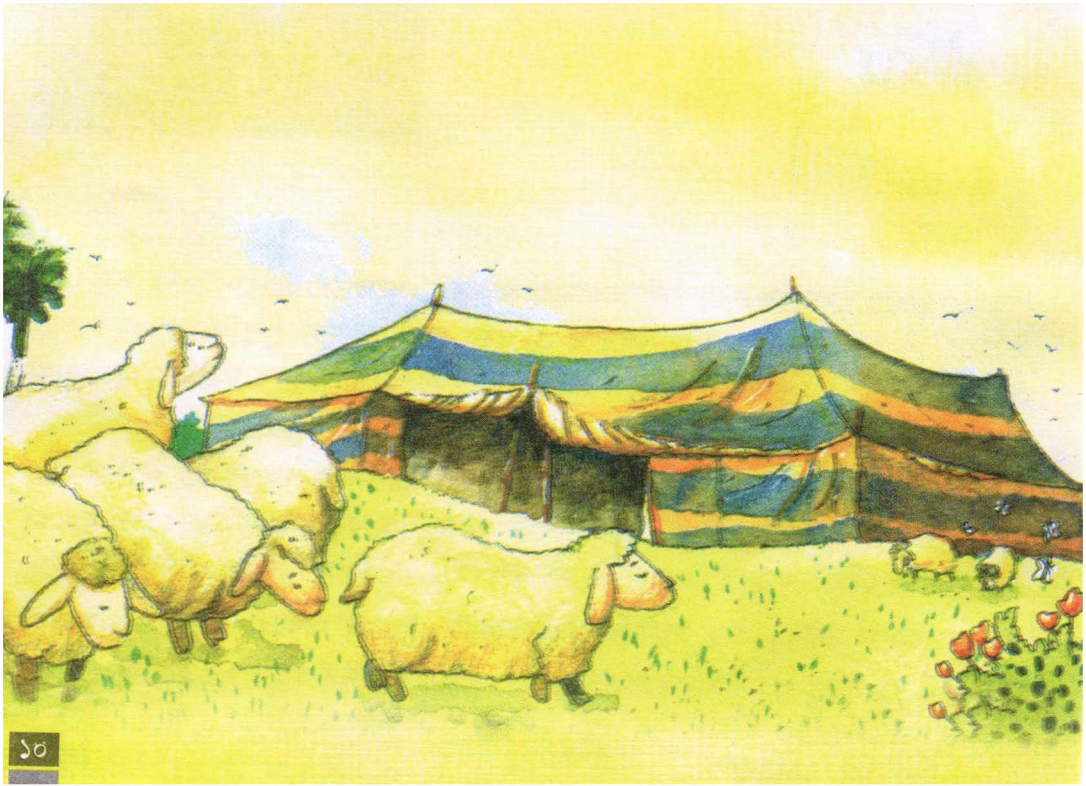

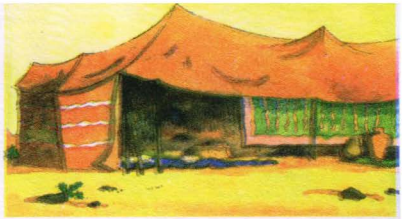

হালিমার মেষগুলো মোটাতাজা হলো। তাঁর মরা খেজুর গাছে ভাল ফলন এলো। শীর্ণ ও রোগা ছাগলগুলো বেশি পরিমাণ দুধ দিতে শুরু করল। শিশু নবীর কারণে হালিমার ঘর আনন্দে ভরে উঠল। তাই তিনি শিশু নবীকে অতি যত্ন ও আদরে গড়ে তুলতে লাগলেন।

নবী মুহাম্মদ (সা) চার বছর বয়সে উপনীত হলেন। তখন একদিন সহসা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাইল (আ)। তিনি শিশু মুহাম্মদ (সা)-এর দেহকে পবিত্রতা দান করলেন।

শিশু নবী বড় হতে লাগলেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর মুহাম্মদ (সা) মায়ের কোলে ফিরে গেলেন। প্রাণের শিশুকে কাছে পেয়ে মা আমিনার বুক আনন্দে ভরে গেল। তারপর একদিন মা আমিনা মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়ে গেলেন মদিনায়। সেখানে ছিল আবদুল্লাহর কবর। মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মের ছয় মাস আগে মদিনায় পিতা আবদুল্লাহ ইনতেকাল করেন।

মদিনায় তাঁরা কবর জিয়ারত করলেন। জিয়ারতের পর মক্কায় ফেরার পথে আমিনাও ইনতেকাল করেন। প্রিয় জননীকে হারিয়ে মুহাম্মদ (সা) পুরোপুরি এতিম হয়ে পড়েন। তারপর তিনি দাদা আবদুল মুত্তালিবের কাছে বড় হতে লাগলেন।

দাদা মুত্তালিব নাতি মুহাম্মদ (সা)-কে খুব ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসাও বেশি দিন টিকল না। মুহাম্মদ (সা)-এর বয়স আট বছরে পৌঁছলে দাদা মৃত্যুবরণ করেন। এরপর চাচা আবু তালিব বালক মুহাম্মদ (সা)-এর দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এ সময় আরবের অবস্থা খুব ভালো ছিল না। লোকেরা আল্লাহর পথে চলত না। তারা মূর্তি পূজা করত। তা ছাড়া আরবের লোকেরা ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি-কাটাকাটি, লুট-তরাজ করত। এসব অনাচার বালক মুহাম্মদ (সা)-এর মোটেও ভালো লাগত না। তাই তিনি ভাবনায় পড়ে গেলেন।

মাঝে মাঝে তিনি পাহাড়ের নির্জন স্থানে গিয়ে আল্লাহকে নিয়ে ভাবতেন। তিনি প্রায়শই মেষ চরাতে পাহাড়ে যেতেন এবং এ সুযোগে আল্লাহর কথা ভাবতেন।

তিনি সব সময় ভালো ভালো কাজ করেন, ভালো ভালো কথা বলেন, মানুষকে ভালো কাজের উপদেশ দেন। তিনি মানুষের আপদে-বিপদে সাহায্য করেন। লোকেরা তাঁকে মান্য করে, তাঁকে সবাই খুব পছন্দ করে। মানুষ তাঁর কাছে মাল-সম্পদ আমানত রাখে। তিনি সবার অর্থ-সম্পদ ঠিকমত ফেরত দেন। তাই মানুষ তাঁকে 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসী বলে ডাকত। দেখতে দেখতে মুহাম্মদ (সা) পঁচিশ বছর বয়সে উপনীত হলেন।

তখন মক্কায় একজন বড় ধনী মহিলা ছিলেন। নাম খাদিজা। তাঁর বড় মাপের ব্যবসা ছিল। এই ব্যবসার দায়িত্ব পেলেন মুহাম্মদ (সা)। তিনি অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সাথে খাদিজার ব্যবসা পরিচালনা করেন। এতে খাদিজার ব্যবসার প্রভূত উন্নতি হয়।

الله

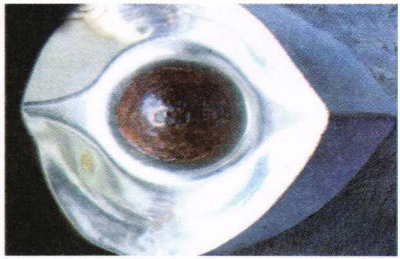

খাদিজা মুহাম্মদ (সা)-এর সততা ও সাধুতায় মুগ্ধ হন। নবীজির সাথে খাদিজার বিয়ের প্রস্তাব করা হয়। বিয়ের পর খাদিজা (রা) তাঁর বিপুল সম্পদ রাসূল (সা)-এর নিকট অর্পণ করেন।

ধন-সম্পদের প্রতি মুহাম্মদ (সা)-এর মোটেও আগ্রহ ছিল না। তাই তিনি সব সম্পদ মানুষের মাঝে অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহর কাজে মনোনিবেশ করেন। হযরত খাদিজা (রা)-এর গর্ভে দুই ছেলে এবং চার কন্যার জন্ম হয়। কিন্তু ছেলে সন্তানরা শিশু বয়সেই ইনতেকাল করেন। হযরত ফাতিমা (রা) ছাড়া অন্যসব কন্যাও খাদিজা (রা)-এর ইনতেকালের আগেই ইনতেকাল করেন।

মক্কা নগরীতে তৈরি হয়েছিল কাবাঘর। এটি ছিল অতি প্রাচীন। তা ছাড়া এক বন্যার কারণে কাবাঘরের দেয়াল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই কাবাঘর পুনঃনির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিলো। কুরাইশরা মিলে শক্ত দেয়াল গড়ে কাবার নির্মাণকাজ শেষ করল। তবে সমস্যা দেখা দিলো হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর স্থাপন করা নিয়ে।

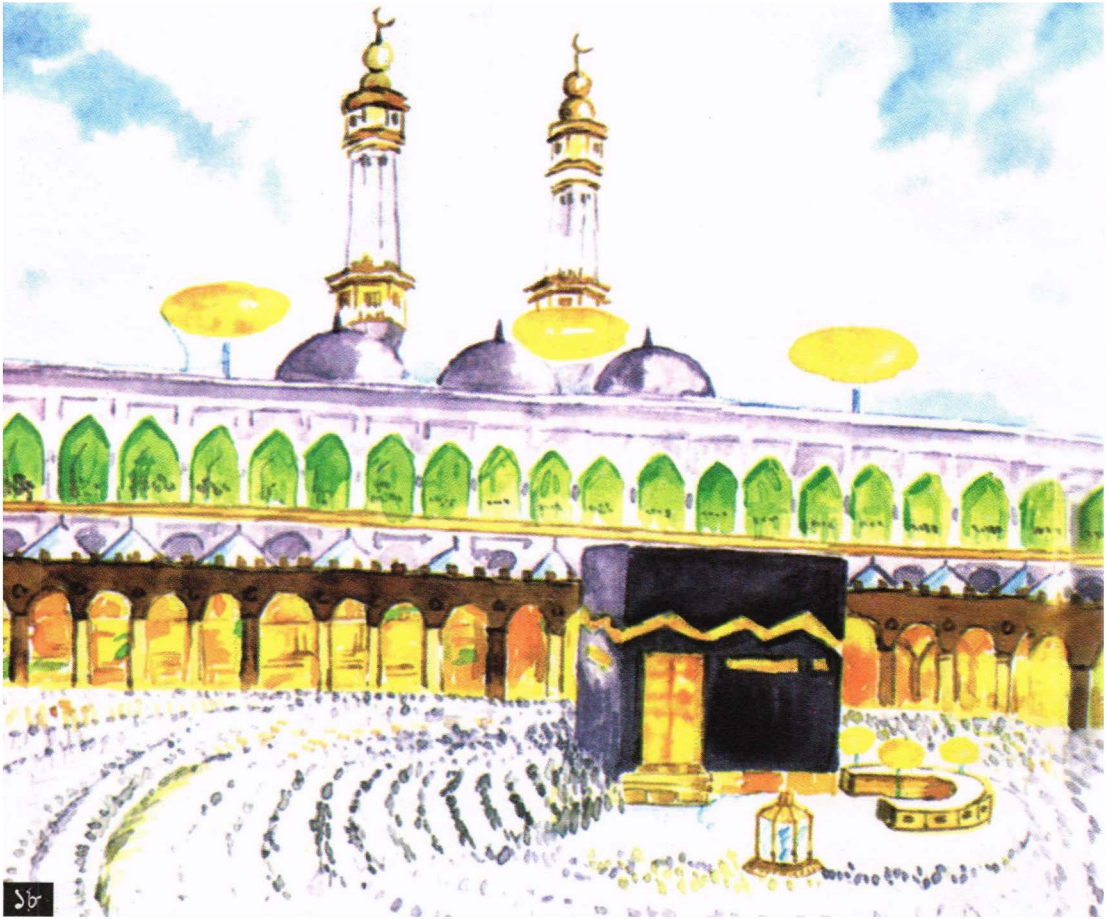

কালো পাথর বসাতে গিয়ে গোত্রে গোত্রে ঝগড়া-ঝাটি তীব্র আকার ধারণ করল। এমন সময় এক গোত্রপতি এক প্রস্তাব রাখলেন। তিনি বললেন, পরদিন সকালে কাবাঘরে যে প্রথম প্রবেশ করবে তার ওপর কালো পাথর বিরোধ সমাধানের ভার দেয়া যেতে পারে। এতে সবাই রাজি হলো। পরদিন দেখা গেল আল-আমিন নামে পরিচিত মুহাম্মদ (সা) কাবাঘরে সবার আগে প্রবেশ করছেন। তাঁর ওপর কালো পাথর বসানোর দায়িত্ব দেয়া হলো। আল্লাহর নবী চমৎকারভাবে বিষয়টির সমাধান করলেন। তিনি একটি কাপড়ের ওপর কালো পাথরটিকে স্থাপন করলেন। তারপর চার গোত্রের চার নেতাকে চার কোণে ধরে তা ওঠাতে বললেন। আর তিনি নিজে পাথরটি দেয়ালের যথাস্থানে স্থাপন করলেন। এটা নবুওয়ত পাবার অনেক আগের ঘটনা।

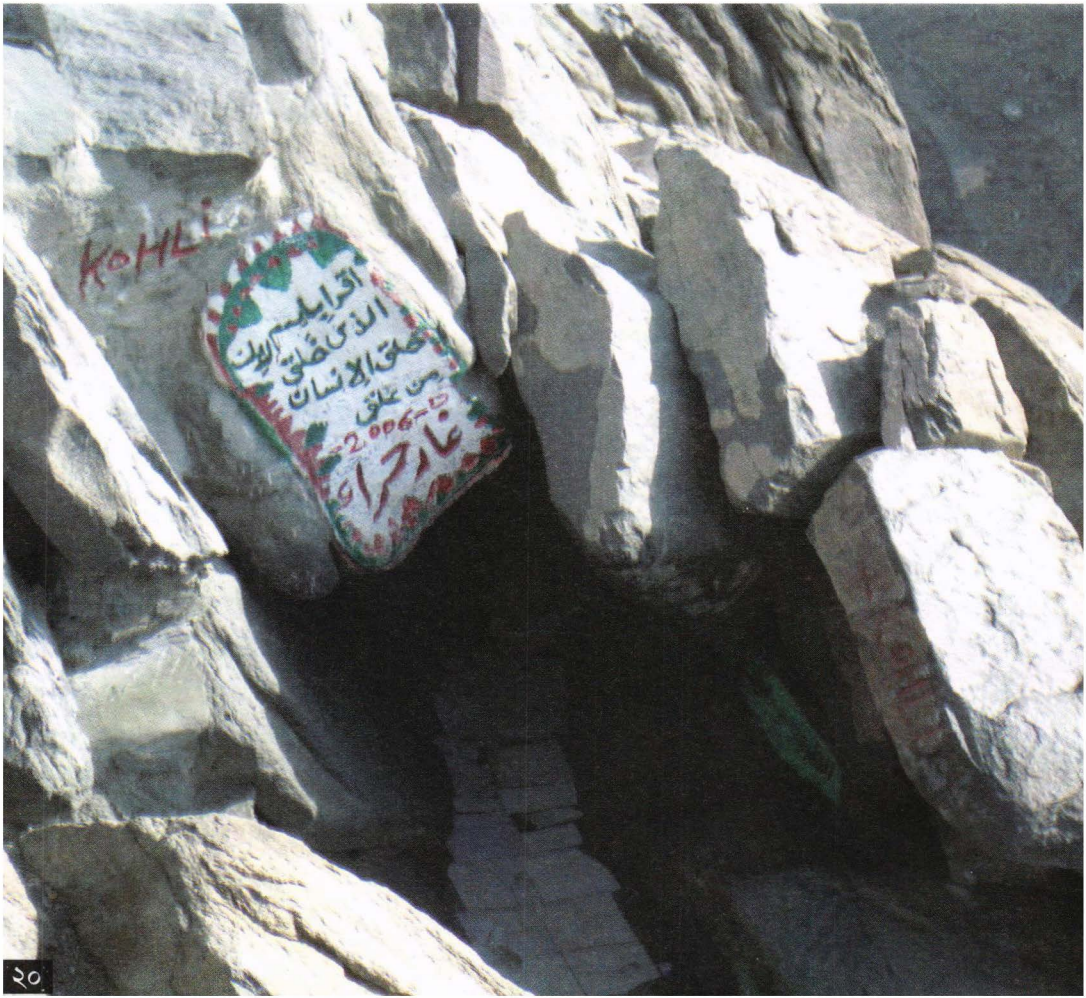

KOHLI
اقرا باسم ربك
الذى خلق
خلق الانسان
من علق
2006
غار حراء

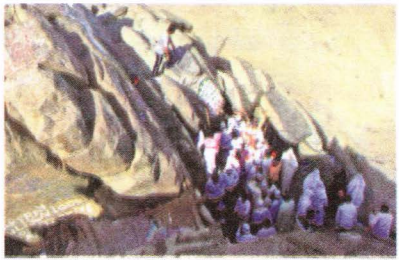

আরবের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। এতে মুহাম্মদ (সা)-এর মন ভারাক্রান্ত হলো। তাই তিনি মানবতার মুক্তির পথ খুঁজতে লাগলেন। এ জন্য অধিকাংশ সময় তিনি হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। একদিন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় হঠাৎ জিবরাইল (আ) সেখানে হাজির হলেন। তিনি মুহাম্মদ (সা)-কে বললেন, 'পড়ুন' । মুহাম্মদ (সা) বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' এরপর জিবরাইল (আ) মুহাম্মদ (সা)-কে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'পড়ুন, আপনার প্রভু আল্লাহর নামে, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।'

এই অস্বাভাবিক অবস্থায় মুহাম্মদ (সা) অত্যধিক ভয় পেয়ে গেলেন। তাই তিনি হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ি ফিরে গেলেন এবং স্ত্রী খাদিজা (রা)-কে ডেকে বললেন, 'আমাকে ঢেকে দাও। আমাকে ঢেকে দাও।'

হযরত খাদিজা (রা) বারবার অনুরোধ করলে রাসূল (সা) তাঁর কাছে সবকিছু খুলে বললেন। খাদিজা (রা) স্বামীকে সাহস জোগালেন। তিনি বললেন, 'আপনার কোনো ভয় নেই। আল্লাহ আপনার কোনো ক্ষতি করবেন না। কেননা, আপনি একজন ভালো মানুষ এবং আপনি সব সময় মানুষকে সাহায্য করেন।'

সেই সময় আরবে আল্লাহর জ্ঞানে সমৃদ্ধ একজন অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন। নাম তাঁর ওরাকা। তিনি খাদিজা (রা)-এর চাচাত ভাই। খাদিজা (রা) স্বামীকে নিয়ে ওরাকার কাছে গেলেন। সব শুনে ওরাকা বললেন, 'যে জিবরাইলকে হযরত মূসা (আ)-এর কাছে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন, তিনিই এই জিবরাইল। আমার ভয় হয়, আমি যদি বেঁচে থাকি তা হলে দেখতে পাব লোকেরা তাঁকে মক্কা থেকে বের করে দেবে।'

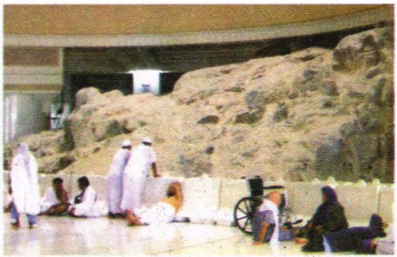

এভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বপ্রথম আল্লাহর বাণী পেলেন। আর এটাই হলো ওহি। রাসূল (সা) এভাবে নবুওয়ত লাভ করলেন। মহানবী (সা)-এর বয়স তখন চল্লিশ বছর। আল্লাহর নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দীন পেলেন তার নাম ইসলাম। ইসলামের প্রতি প্রথম বিশ্বাস স্থাপন করলেন নবীজির স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা)। তারপর তাঁর দাস হযরত জায়েদ (রা) এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু হযরত আবু বকর (রা) গোপনে আল্লাহর দীন ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারপর একদিন জিবরাইল (আ) মহানবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, 'তুমি কুরাইশদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও।'

একদিন সকালবেলা তিনি আস-সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে কুরাইশদের একত্র করলেন। তিনি তাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'আমি যদি বলি একদল অশ্বারোহী সৈনিক পাহাড়ের অপর পাড়ে তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করছে, তা হলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?'

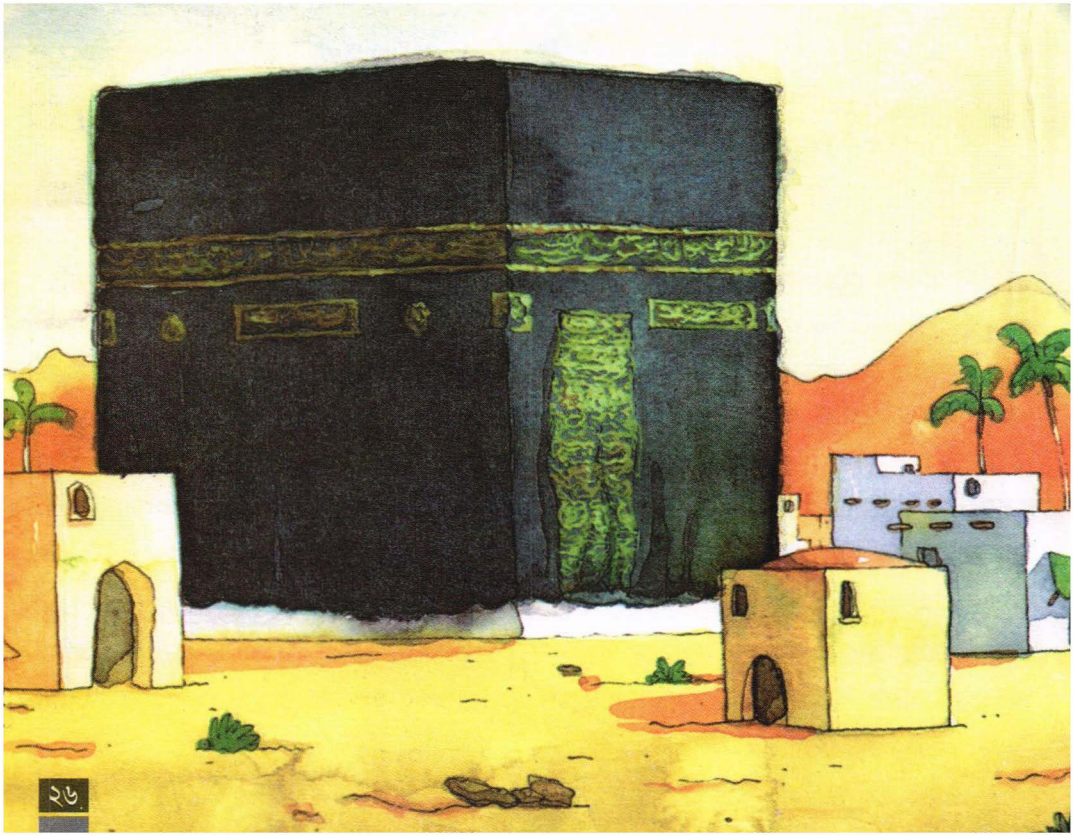

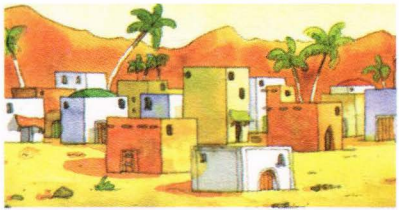

সবাই সমস্বরে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস করব। কেননা, তুমি আল-আমিন। তুমি যে সত্যবাদী।'

এবার মুহাম্মদ (সা) সবাইকে এক আল্লাহর কথা বললেন এবং তাঁকে না মানার ভয়ানক শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলেন। তিনি সবাইকে এক আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে আহ্বান জানালেন। এতে হযরতের চাচা আবু জাহেল খুব ক্ষিপ্ত হলো এবং সে মহানবী (সা)-কে উদ্দেশ করে বলল, 'তুমি ধ্বংস হও!'

এ কথা বলার সাথে সাথে আবু জাহেল মুহাম্মদের ওপর একটি পাথর ছুড়ে মারল। এটি গিয়ে লাগল মুহাম্মদ (সা)-এর কপালে। এতে তাঁর কপাল ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

কুরাইশরা মুহাম্মদ (সা)-এর দাওয়াত কবুল করতে চাইল না, বরং তারা চরম বিরোধিতা করল। শুধু তাই নয়, যারা ইসলাম কবুল করত কাফের কুরাইশরা তাদের ওপর নানা রকম অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাত। এমনকি তারা মুহাম্মদ (সা)-এর ওপরও নির্যাতন চালাত। মহানবী মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সাথে অন্যসব মুসলমানও মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতেন। এতে দিনকে দিন মুসলমানের সংখ্যা বাড়তে লাগল। মহানবী (সা)-এর দাওয়াতকে বানচাল করার জন্য কুরাইশরা নানা কৌশল অবলম্বন করল। তারা মহানবীকে ধন-সম্পদ, হীরা-জহরত, এমনকি বাদশাহি প্রদান করারও প্রস্তাব রাখল। মহানবী (সা) ঘৃণাভরে কুরাইশদের সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে কাফেররা আরো বেশি ক্ষিপ্ত হলো। তারা মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো।

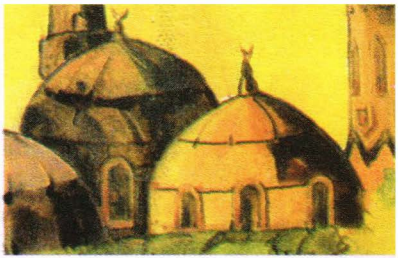

তারপরও যখন ইসলামের কাজ বন্ধ করা গেল না, তখন কাফের কুরাইশরা মহানবী (সা) ও তাঁর পরিবারের সবাইকে বয়কট করল। মক্কা ছেড়ে তাদেরকে এক উপত্যকা 'শেবে আবি তালিবে' যেতে বাধ্য করল। নও-মুসলিমরাও সেখানে গিয়ে জান বাঁচাল।

শেবে-আবি তালিবে তাঁরা তিন বছর কাটালেন। তখন কুরাইশরা সেখানে খাবার ও পানি দেয়াও বন্ধ করে রেখেছিল। ফলে মুসলমানরা এক কঠিন অবস্থার মধ্যে দিন কাটালেন। না খেয়ে, অসুখে-বিসুখে তাঁরা সবাই দুর্বিষহ জীবন কাটালেন। একসময় বয়কট তুলে নেয়া হলে সবাই আবার মক্কায় ফিরে এলেন। এদিকে নবী (সা)-এর স্ত্রী খাদিজা (রা) ও চাচা আবু তালিব ইনতেকাল করলেন। ফলে দুনিয়ায় আপনজন বলতে মহানবী (সা)-এর আর কেউ রইল না।

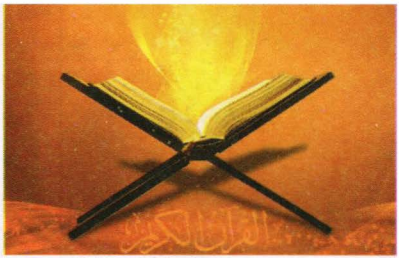

এদিকে মক্কার মুসলমানদের ওপর কাফেরদের নির্যাতন বেড়ে চলল। রাসূল (সা) নিজেও এই কঠিন নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। তিনি ঠিক করলেন তায়েফে গিয়ে তিনি ইসলামের কাজ করবেন। পালিত পুত্র জায়েদকে সাথে নিয়ে তায়েফে গেলেন তিনি। কিন্তু তায়েফের নেতারা মুহাম্মদ (সা)-কে গ্রহণ করল না, বরং তাদের দাস এবং দুষ্ট ছেলেদেরকে রাসূলের পেছনে লেলিয়ে দিলো। তারা মহানবী (সা)-এর ওপর পাথর নিক্ষেপ করল। এতে মুহাম্মদ (সা)-এর শরীর ফেটে রক্ত পা পর্যন্ত গড়িয়ে পড়ল। এই রক্তাক্ত অবস্থায় নবী (সা) একটি ফলের বাগানে আশ্রয় নিলেন এবং সেখানে খানিকটা বিশ্রাম করলেন। এমন সময় বাগানের এক দাস রাসূল (সা)-কে কিছু ফল সরবরাহ করল। মহানবী (সা) 'বিসমিল্লাহ' বলে সেই ফল খেলেন। মুহাম্মদ (সা)-এর মুখে বিসমিল্লাহ' শুনে খ্রিষ্টান দাস মুগ্ধ হলো। সে মহানবী (সা)-এর কাছে ইসলামের কথা শুনে মুসলমান হয়ে গেল।

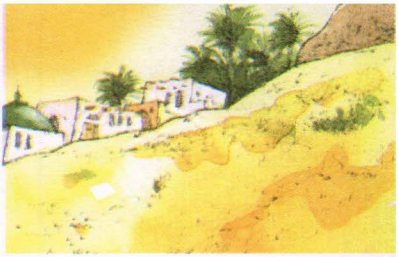

তারপর আল্লাহর নবী (সা) মক্কায় ফিরে আসার জন্য রওয়ানা করলেন। এমন সময় সেখানকার আকাশে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাইল (আ) পর্বতের ফেরেশতাসহ হাজির হলেন। পর্বতের ফেরেশতা মহানবী (সা)-কে বললেন, যদি তিনি চান তা হলে এখানকার পর্বতগুলোকে তিনি উল্টিয়ে দেবেন এবং তায়েফবাসীকে ধ্বংস করে ফেলবেন।

কিন্তু দয়ার নবী মুহাম্মদ (সা) বললেন, 'না, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। এমনও তো হতে পারে, এসব লোকের সন্তানেরা ভালো মুসলমান হতে পারে।'

মহানবী (সা) তাঁর দাস জায়েদকে নিয়ে মক্কায় ফিরে এসে আবারও লোকদেরকে আল্লাহর পথে ডাকতে লাগলেন। এ সময় কিছু বিদেশী আগন্তুক ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা নিজ দেশে ফিরে গিয়ে তাদের লোকদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করতে আহ্বান জানালেন। নও-মুসলিমের সাতজন ছিলেন মদিনার অধিবাসী। তাদের আহ্বানে মদিনাবাসীর অনেক লোক ইসলাম কবুল করলেন।

এদিকে মক্কায় ইসলামের কাজ কঠিন হয়ে পড়ল। কাফেররা শেষমেশ আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলো। এমন সময় এক রাতে মহানবী (সা) যখন ঘুমে তখন আল্লাহ জিবরাইল (আ)-কে তাঁর কাছে পাঠালেন। আল্লাহ তাঁর নবীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চান, এই বার্তা নিয়েই এলেন জিবরাইল (আ)। তিনি রাসূল (সা)-কে 'বোরাক' নামীয় বাহনের ওপর চড়ে বসতে বললেন। তাঁরা প্রথমে জেরুজালেমের মসজিদ বায়তুল মাকদাসে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে সকল নবী-রাসূল মহানবী (সা)-এর ইমামতিতে নামাজ আদায় করলেন।

তারপর জিবরাইল (আ) রাসূল (সা)-কে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছলেন। সেখানে হযরত আদম (আ)-এর সাথে তাঁর দেখা হলো। হযরত আদম (আ) দুনিয়ার প্রথম মানুষ এবং মানবজাতির পিতা। তারপর মহানবী (সা) একটার পর একটা আকাশ পেরিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। প্রতিটি আকাশেই অনেক নবী ও রাসূলের সাথে তাঁর দেখা হলো। এর মধ্যে ছিলেন হযরত ইয়াহইয়া (আ), হযরত ঈসা (আ), হযরত ইউসুফ (আ), হযরত ইদরিস (আ), হযরত হারুন (আ), হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ইবরাহিম (আ)। সপ্তম আকাশের পর আল্লাহর রাসূল (সা) 'সিদরাতুল মুনতাহা' বা সপ্তম আকাশের সীমানা অতিক্রম করলেন। তারপর তিনি আল্লাহর সাথে কথা বললেন। মহানবী (সা)-এর এই আকাশ ভ্রমণকে আল-ইসরা এবং আল-মিরাজ বলা হয়। এ সময় তিনি বেহেশত, দোজখসহ আরো অনেক কিছুই দেখতে পান। মিরাজের সময় উম্মতের জন্য তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নির্দিষ্ট করে আনেন।

পরের দিন সকালে মহানবী (সা) মিরাজের এই ঘটনা মক্কার কুরাইশদের কাছে উপস্থাপন করলে সবাই বিস্মিত হলো। তারা নবী (সা)-এর কথা বিশ্বাস করতে পারল না। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) বিনা প্রশ্নে তা বিশ্বাস করলেন। এ জন্য আল্লাহর নবী আবু বকর (রা)-কে 'আস-সিদ্দিক' বা পরম বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেন।

আল্লাহর নবীর মিরাজের কয়েকদিন পরই মদিনা থেকে বারোজন লোক মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এই নও-মুসলিমরা আল্লাহর নবীকে মদিনায় যাওয়ার অনুরোধ করলেন।

তখন মহানবী (সা) মু'সাব বিন উমায়েরকে নও-মুসলিমদের সাথে মদিনায় পাঠালেন, যাতে তিনি লোকদেরকে ইসলামের শিক্ষা দিতে পারেন। ফলে মদিনায় ইসলামের দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল এবং অনেকেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলো।

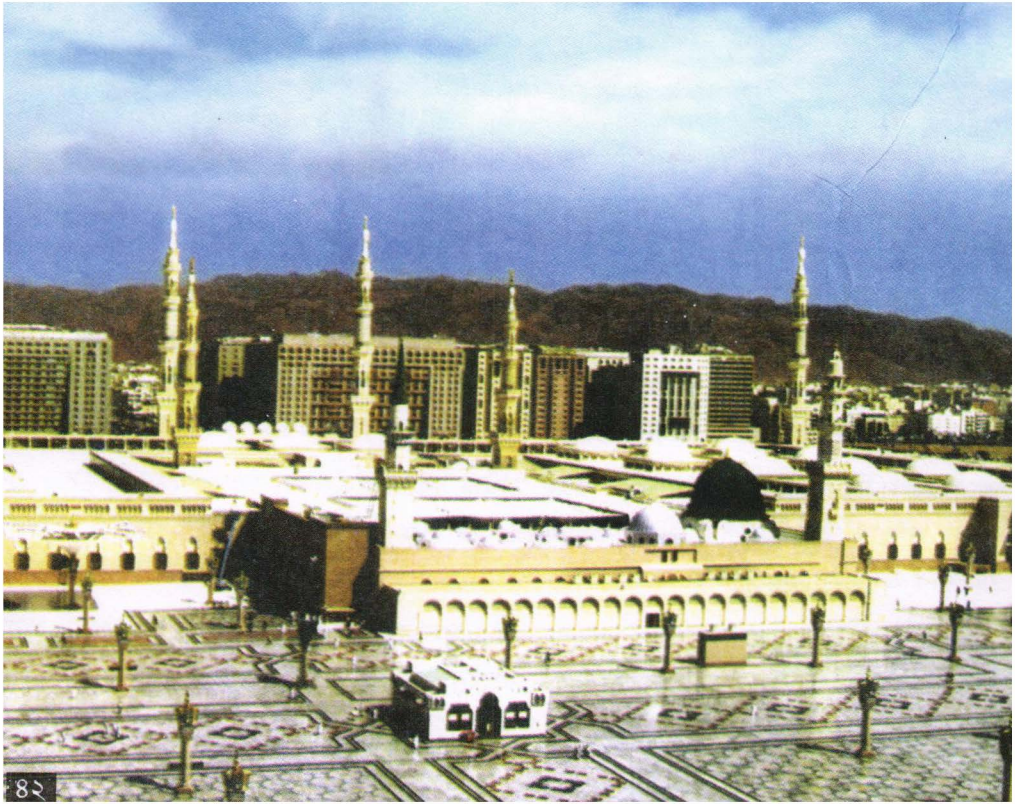

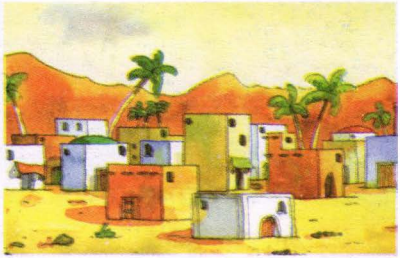

মদিনার এমন কোনো ঘর বাকি ছিল না, যেখানে একজন না একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। পরের বছর তিয়াত্তর জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা আকাবা নামক স্থানে এসে গোপনে মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তারা মহানবী (সা)-এর কাছে শপথ নিলেন। এইসব লোক অঙ্গীকার করলেন, যে কোনো মূল্যে তারা মহানবী (সা)-এর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন এবং তাঁকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন। এরপর মক্কার অনেক মুসলিম পরিবার-পরিজনসহ মদিনায় হিজরত করলেন। শুধু বাকি রইলেন আলী (রা) এবং আবু বকর (রা)।

মুসলমানরা মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যাচ্ছে, এ খবর কুরাইশদের কানে পৌঁছলে তারা খুব বিচলিত হয়ে পড়ল। তারা চোখেমুখে সরষের ফুল দেখতে লাগল। তাই নিরুপায় হয়ে কুরাইশরা মহানবী (সা)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

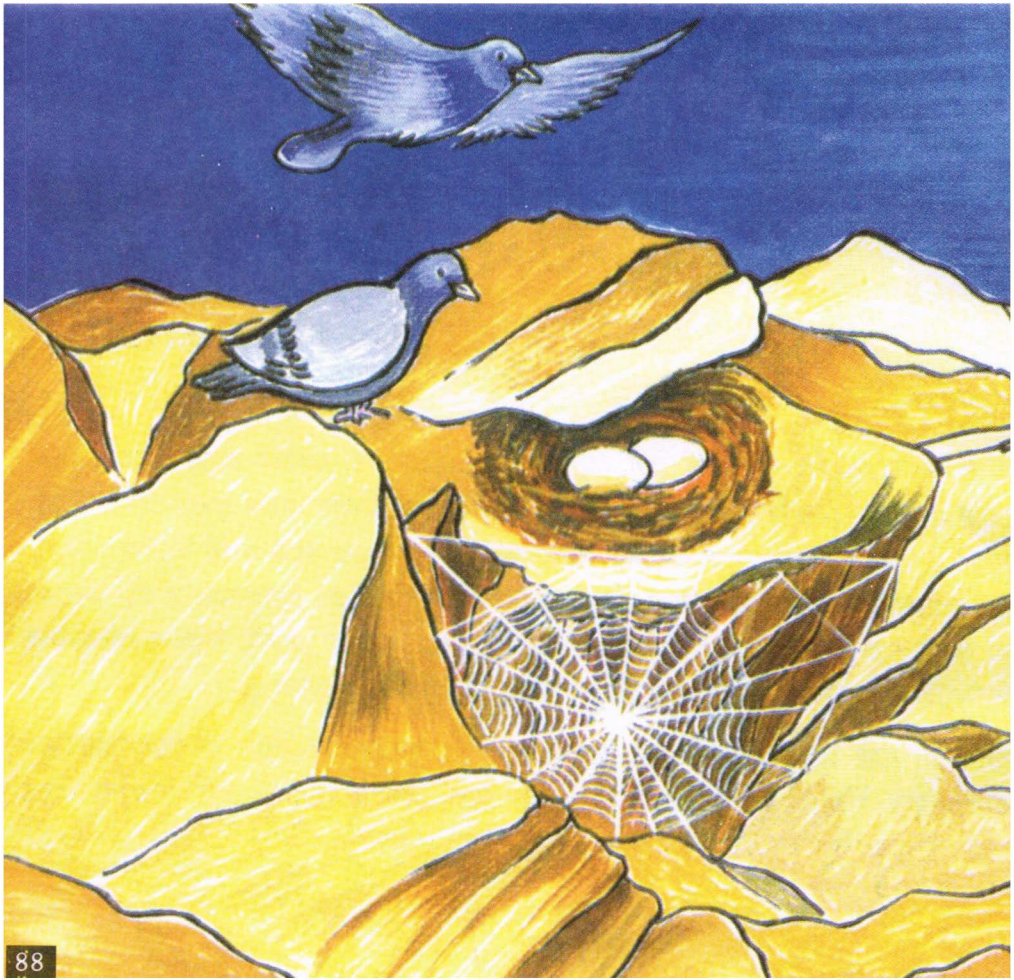

এই অবস্থায় এক রাতে মহানবী (সা) হযরত আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে আল্লাহর আদেশে মক্কা ত্যাগ করলেন। মদিনার উদ্দেশে রওয়ানা করে তিনি প্রথমে 'সওর' পর্বত গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এই সময় মক্কার কাফের কুরাইশরা তাঁদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজল, কিন্তু তাঁদের সন্ধান পেল না। তিনদিন পর তাঁরা আবার যাত্রা শুরু করলেন। সুরাকা বিন জুসহাম নামীয় এক কুরাইশ মহানবী সা)-এর কাফেলাকে অনুসরণ করে সহসাই তাঁদের কাছাকাছি এসে পৌঁছল। কিন্তু তার ঘোড়া বারবার হোঁচট খাওয়ায় সে হতাশ হলো। এতে সে প্রতিশোধস্পৃহা ত্যাগ করে আল্লাহর নবীর সাথে দেখা করল এবং ইসলাম গ্রহণ করে মক্কায় ফিরে এলো।

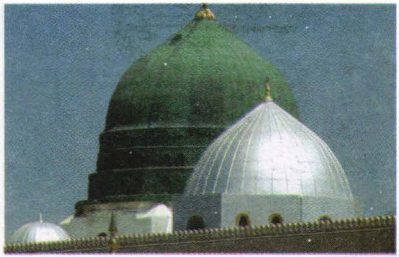

তারপর মহানবী (সা) ও আবু বকর (রা) নিরাপদে মদিনার উদ্দেশে পথ চলতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা মদিনায় গিয়ে পৌঁছলে সেখানকার মুসলমানরা আল্লাহর নবীকে অভ্যর্থনা জানাল। মদিনায় আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা) তাঁর নতুন মিশন শুরু করলেন। মানুষ দলে দলে এসে আল্লাহর নবীর সাথে সাক্ষাৎ করল। ফলে ইসলাম এবারে দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলল। মদিনায় কায়েম হলো ইসলামী রাষ্ট্র। মহানবী (সা) হলেন সেই মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান।

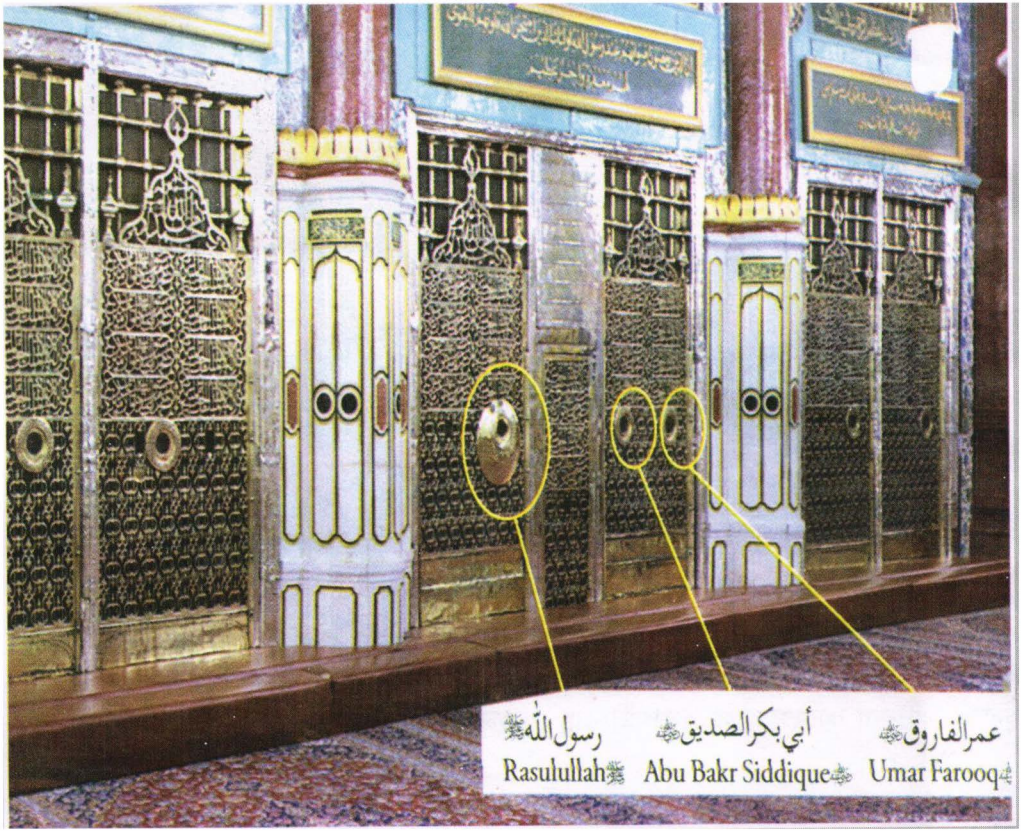

رسول الله ﷺ
أبي بكر الصديق ؓ
عمر الفاروق ؓ
Rasulullah ﷺ
Abu Bakr Siddique ؓ
Umar Farooq ؓ

'নবী-রাসূল কাহিনী' সিরিজ সম্পর্কে কয়েকটি কথা

'নবী' অর্থ সংবাদবাহক, মানে যিনি কোনো সংবাদ বহন করেন। আল্লাহর প্রেরিত সেই মহামানবকে নবী বলা হয়, যিনি নবুয়্যাত প্রাপ্তির পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি নিঃস্বার্থ আহ্বান জানান। আর 'রাসূল' অর্থ প্রেরিত দূত, বাণীবাহক, সংবাদদাতা, পত্রবাহক ইত্যাদি। আল্লাহর কিতাবসহ প্রেরিত এমন মহামানবকে রাসূল বলা হয়, যিনি আল্লাহর একত্ববাদের দিকে মানুষকে আহ্বান জানান। আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত অনেক নবী-রাসূলকে আল্লাহ দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। মানুষ যখনই আল্লাহকে ভুলে বিপথে পরিচালিত হয়েছে, তখনই আল্লাহ নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। তাঁরা পথভোলা মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান।

কোনো মানুষের ঈমানদার হওয়ার জন্য আল্লাহ প্রেরিত নবী-রাসূলদের ওপর আস্থা স্থাপন করা জরুরি। আল-কুরআনে পঁচিশজন নবী-রাসূলের পরিচয় পাওয়া যায়। এসব মহামানবের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ মুসলমান মাত্রই থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে আমাদের সন্তানদের জন্য বিষয়টি বেশি জরুরি। 'নবী-রাসূল কাহিনী' সিরিজে আমরা পঁচিশজন নবী-রাসূল (সা)-এর জীবনীর ওপর পুস্তক প্রকাশ করার প্রয়াস নিয়েছি। আমাদের প্রিয় সোনামণিরা এতে উপকৃত হবে। আল্লাহতাআলা আমাদের চেষ্টাকে কবুল করুন।

শিশু কানন
৩০৭, উলন রোড, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা
ফোন ঃ ০১৭১০-৩৩০৪৩০

ISBN 984-83-9422-2
9 799848 394228